বেলা ফুরাবার আগে

বিভাগ/অধ্যায়ঃ আলেম কমানোর ঘোষণা এবং একজন নায়িকার উপলব্ধি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

আলেম কমানোর ঘোষণা এবং একজন নায়িকার উপলব্ধি

বিজ্ঞানময় আবিস্কার মানবজাতিকে যেসব নিত্যসৃষ্টে বাধিত ও ব্যাকুল করেছে সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে বিনোদন সংস্কার। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার হাত ধরাধরি করে সিনেমা-থিয়েটার মানুষের বিনোদন জগতকে মাতিয়ে রেখেছে উন্মাতাল আবেগপ্রবণতায়। বাস্তবজীবনে ব্যর্থ কিংবা হতাশাক্লিষ্ট দর্শক সিনেমা-থিয়েটারে খুঁজে পায় শিহরিত বিনোদন ও উত্তেজক আনন্দ। কারণ বাস্তবজীবনে যা আদৌ সম্ভব নয় তাই দেখানো হয় এসব জায়গায়। একমাত্র সিনেমা-থিয়েটার আর নাটক-নোবেলেই সম্ভব অবাস্তব কাহিনীর অবতারণা। কারণ এখানে সত্যিকারের জীবন্ত মানুষের মুখোমুখি হওয়ার দায় নেই।

এখানে দৃশ্যত নারী-পুরুষদের কোনো অসম্ভব আচরণ বা অস্বাভাবিক উক্তি করা ও কিছু করে দেখানোতে বাধা নেই। তাই বাস্তব জীবনে যা একেবারেই অসম্ভব কিংবা কল্পনাতেও যা আসে না, নাটক-সিনেমায় সেগুলো দেখে দর্শকরা ‘ওয়াও’ আর ‘এঙ্কোর এঙ্কোর’ বলে চেঁচিয়ে ওঠে! দর্শকরা জানে না, সিনেমায় যে প্রণয়নিবেদন কিংবা অবিশ্বাস্য দৃশ্য প্রদর্শিত হয় অথবা ভিলেন কর্তৃক মায়ের কাছ থেকে সন্তান কেড়ে নেয়ার যে উত্তেজক দৃশ্য দেখে তারা ব্যথিত হয় তার ষোলো আনাই মিছে, ষোলো আনাই স্টেজ-ম্যানেজড্‌! ষোলো আনাই ফান ও ফাঁকি! কিন্তু হতভাগ্য দর্শকের এসব জানার উপায় নেই। রচিত কাব্যের বর্হিদেশে, অভিনীত নাটকের নেপথ্যে গল্পের বাস্তবতা চিরকাল থাকে লোকলোচনের অন্তরালে। তাই নাটকের যেখানে শেষ জীবনের সেখানেই শুরু!

কিন্তু তবু কথা থেকে যায়। রচিত কাব্য ও কল্পিত নাটকই কখনও কখনও মানুষের জীবনে চরম সত্য হয়ে ধরা দেয়। সেই সত্য গল্প কাহিনীর গল্পের চেয়েও নির্মম, অভিনীত নাটকের চেয়েও অবিশ্বাস্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করে! সেই অবিশ্বাস্য একটা গল্পই আজ আপনাকে শোনাতে চাই।

প্রেক্ষাগৃহের উত্তাপ কখনও কখনও বাইরেও আঘাত হানে। শ্রুতিগর্জন করে এই জগতের বাইরের লোকদের কানেও। চেপে ধরার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্যের ঘাম নাকে প্রবিষ্ট হওয়ার মতো কানে পড়ে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত তথ্য। হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী ‘সুদের ধোঁয়া সব মানুষকে আচ্ছন্ন করা’র মতোই।

কল্পনার জগতকে কেন্দ্র করে বাস্তবজীবন রচিত হয় না। ঠিক তদ্রূপ কেউই প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত কোনো অভিনয় কিংবা অবাস্তব জীবনের মহড়া বাস্তবজীবনে প্রতিফলিত করে না কিংবা সে অনুযায়ী সংসারও পাতে না। তাই প্রযোজকরা বাস্তবজীবনকে অবলম্বন করেই অবাস্তব ঘটনার অবতারণা ঘটান। সেই অবাস্তব অবতারণায় একজন পুরুষের (নায়কের) পাশে সার্বক্ষণিক থেকে ছবিকে রঙে-ঢঙে ফুটিয়ে তুলতে একজন নায়িকার প্রয়োজন হয়।

নব্বই দশকে ‘সোহরাব-রুস্তম’ নামের একটা ছবি নাকি খুব আলোড়ন তুলেছিল। আর সেই ছবিতে ইলিয়াস কাঞ্চনের পাশে একজন নায়িকা ছিলেন। নাম তার বনশ্রী (মূল নাম শাহিনা আখতার)। মুক্তি-পরবর্তী ছবিটি ব্যাপক ব্যবসা সফলও হয়েছিল। অজপাড়া গাঁ থেকে উঠে আসা একটা সরল মেয়ে এই ছবির নায়িকা বনশ্রীও রাতারাতি তারকা বনে গিয়েছিলেন। তাই দামি গাড়িতে ভ্রমণ, বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষেই

কেটেছে বনশ্রীর সেই তারকাখ্যাতির দিনগুলো। বললে বিশ্বাস হবে! সেই তারকা নায়িকা বনশ্রী আজ ঢাকার রাজপথের ফুটপাতে হেঁটে হেঁটে এবং বাসযাত্রীদের কাছে নামাজ শিক্ষার বই বিক্রি করেই দিন যাপন করছেন!

একসময়ের বিতর্কিত প্রযোজক ফারুক ঠাকুর এই বনশ্রীকে নিয়ে নির্মাণ করেছিলেন ‘সোহরাব-রুস্তম’ ছবিটি। তখন বনশ্রী ফারুক ঠাকুরের বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন বলেও গুঞ্জন ছিল। অথচ বনশ্রী ছিলেন অন্যজনের ঘরণী। তিনি শ্যামল দাস নামের এক হিন্দু স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়তেন। সেই স্যার বনশ্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বনশ্রীর পরিবার থেকে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন। পরে স্বধর্ম ত্যাগ করে তিনি বনশ্রীকে বিয়ে করতে সক্ষম হন। কিন্তু বিয়ের কিছুদিনের মধ্যে মোহ কেটে যায়। যিনি তাকে বিয়ে করার জন্য গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন সেই তিনিই তাকে ছাড়ার ফন্দি করতে থাকেন।

এরপর বনশ্রী নেমেছিলেন শোবিজের কণ্টকাকীর্ণ পথে। যার মাধ্যমে সিনেমা জগতে এসেছিলেন তাকে কড়া শর্ত দিয়েছিলেন পার্শ্বনায়িকা নয়- মূল নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। শুধু তাই নয়, যেনতেন নায়কের সঙ্গে অভিনয় নয়, তখনকার যিনি হিট তার সঙ্গে অভিনয় করবেন। না জানি কী এক জাদু ছিল বনশ্রীর কথায়, আচরণে কিংবা সৌন্দর্যে। যার ফলে সিনেমা জগতের জন্য এই অবাস্তব শর্তও তৎকালীন পরিচালক ফারুক ঠাকুর সহজেই মেনে নিয়েছিলেন এবং প্রথমদিন থেকেই চেয়েছিলেন বনশ্রীকে এদেশের প্রথম সারির একজন নায়িকা বানাবার। এজন্য তিনি একেবারে অনভিজ্ঞ, অপরিচিত ও গ্রাম্য মেয়েটির জন্য ছবিতে বিনিয়োগও করেছিলেন প্রচুর। এরপর ঘটেছিল অনেক কিছু। কিন্তু যেহেতু বনশ্রী আজ ঘরে ফেরার পথে আছেন, নিজ সন্তানকে গড়ে তুলতে চাচ্ছেন একজন ভালো মানুষ হিসেবে তাই সেই অবাঞ্ছিত ইতিহাস উল্লেখ না করাই ভালো।

পত্রিকার খবর, সোহরাব-রুস্তমের পর বনশ্রী অভিনীত ‘নিষ্ঠুর দুনিয়া’ ও ‘ভাগ্যের পরিহাস’ নামের দুটি ছবির কাজও শুরু হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, ছবি ও নাটকের কল্পিত ঘটনা ও আখ্যানই কখনও কখনও মানুষের বাস্তবজীবনের আঙিনায় তীব্রবেগে আছড়ে পড়ে। বনশ্রীর বেলায়ও তাই ঘটল। ছবির সেই কল্পিত ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বনশ্রীর বাস্তবজীবনে আঘাত হানল। সেই আঘাতে জর্জরিত ঘরছাড়া, অর্থহারা, সন্তানহারা বনশ্রী আজ তিন বছরের শিশু সন্তানকে নিয়ে হকারি করে দিনযাপন করছেন! কিছুদিন আগে খবর বেরুলো, শাহবাগে তিনি ফুল বিক্রি করছেন!

ঘটনার সারাংশ হচ্ছে, ফারুক ঠাকুর নিজ বলয়ের বাইরে কারও ছবিতে কাজ করতে দিতেন না বনশ্রীকে। এ নিয়ে বনশ্রীর মনে ক্ষোভ থাকলেও ফারুক ঠাকুরের ভয়ে মুখ ফুটে কিছু বলেননি। বনশ্রী থাকতেন মোহাম্মদপুরের একটি আলিশান বাড়িতে। বিলাসিতারও কোনো কমতি ছিল না। এত সুখ হয়তো তার কপালে সয়নি। একটি দুর্ঘটনা সবকিছু বদলে দেয়। গুলশান এলাকার একটি জমি নিয়ে কিছু লোকের সঙ্গে ফারুক ঠাকুরের বিরোধ ছিল। একদিন প্রতিপক্ষের সঙ্গে বাক-বিতণ্ডার একপর্যায়ে ফারুক ঠাকুরের ছোঁড়া গুলিতে প্রতিপক্ষের এক লোক ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এ ঘটনার পর ফারুক ঠাকুর লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তিনি আর প্রকাশ্যে আসেননি। একা হয়ে যায় বনশ্রী। ফারুক ঠাকুর তাকে ঢাকার নামীদামী এলাকায় একটি বাড়িও করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বনশ্রীর বাবা তাতে অনীহা প্রকাশ করায় তা আর করা হয়নি। ফলে বনশ্রীর জীবনযুদ্ধ আরো কঠিন হয়ে ওঠে।

তারপর থেকেই শুরু হয় বনশ্রীর জীবনযুদ্ধ। ফারুক ঠাকুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বনশ্রীকে নিয়ে আর কেউ ছবি বানাতে আগ্রহী হয়নি। দিন দিন তার অবস্থার অবনতি হতে থাকে। প্রথম স্বামী যে আবেগে স্বধর্ম ত্যাগ করে তাকে বিয়ে করেছিলেন সেই আবেগের বশবর্তী হয়ে খুব দ্রুতই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন। এরপর আশ্রয় হয়ে

ওঠা ফারুক ঠাকুরও খুনের ঘটনায় হারিয়ে গেলেন। ফারুকের এই ঘটনার সময়ও প্রচুর অর্থবিত্ত ছিল তার। কিন্তু সবকিছুতেই যেন পতন শুরু হয়। চতুর্দিক থেকে লোক জড়ো হতে থাকে তার টাকাগুলো মেরে দেয়ার জন্য। আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্যক্তি কেউ ব্যবসা করে দেয়ার নামে। কেউ অল্পদিনের জন্য ঋণ নেয়ার নামে প্রায় কোটি টাকার ব্যাংক-ব্যালেন্স অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষ করে দেয়। বনশ্রী এরপর ধানমণ্ডিতে একটি বিউটিপার্লার করেন। সে ব্যবসাও তিনি বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেননি।

নিজেকে টিকিয়ে রাখতে নিজের চেয়েও কমবয়সী এক ছেলের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। বাড্ডার বসতিতে নতুন স্বামী নিয়ে সংসার শুরু করেন। পালছেঁড়া জীবনতরীর দুর্বল মাঝি হলেও এই স্বামী তার জীবনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন সামনের দিকে। কিন্তু একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে সেই মানুষটিও বনশ্রীকে নিঃসঙ্গ করে পরপারের যাত্রাপথে রওয়ানা হন।

বনশ্রী খুবই বিলাসী, অলংকারপ্রিয় ও সৌন্দর্যসচেতন ছিলেন। জড়োয়া গহনা এবং মোটা ও পুরু অলঙ্কার ছাড়া কখনও এফডিসি মাড়াতেন না। অভিনয়ের সময়েও শরীরে জড়ানো থাকত মূল্যবান অলঙ্কার। যে কয়জন লোকের মূল্যবান গাড়িতে সে সময়ের রাজধানীর পিচঢালা পথ প্রকম্পিত হতো, তিনি ছিলেন তাদেরই একজন। কিন্তু পর্যায়ক্রমে গাড়িও পরিবর্তন হয়েছে, গাড়িতে ওঠার উদ্দেশ্যও পরিবর্তন হয়েছে। জীবনতরীর পাল, মাস্তুল, মাঝি-মাল্লা সবই বিধ্বস্ত হয়েছে। জীবন থেকে সরে গেছে একে একে সব অবলম্বন।

সর্বশেষ যে ঝড় তার জীবনের শেষ অবলম্বন নিশ্চিহ্ন করে দেয় তার ধকল সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রথম ঘরের অষ্টম শ্রেণির মেয়েটিকে তার পরিচিত লোকেরা হাইজাক করে। তিনি মেয়ের শূন্যতায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে যান। ছুটতে থাকেন থানায় থানায়। বিচার চান এই অমানবিক অন্যায়-অপরাধের। কিন্তু সবাই তাকে নিরাশ করে। নিবৃত করেননিজকন্যার দাবি থেকে! এ কোন দুঃসহ সমাজে বাস করছি আমরা? একজন হতভাগা মা তার কন্যা অপহরণের বিচার নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে অপরাধীকে চিহ্নিত করার পরও আইন তার সহায়তা না করে অপরাধীর সহায়তা করে!

বনশ্রী অনেক কাকুতি-মিনতি করেন হাইজাকারদের কাছে একমাত্র অবলম্বন নিজের বুকে ফিরিয়ে দেয়ার। কিন্তু হৃদয় গলে না পাষণ্ডদের। তারা তাকে বিক্রি করে দেয় খারাপ জায়গায়। বুকটা ফেটে যায় বনশ্রীর। নিজকন্যার এই পরিণতি তিনি কিছুতেই বরদাশত করতে পারেন না। একরাশ বেদনা, হতাশা ও জীবনধারনের শেষ অবলম্বন হারিয়ে তিনি রাস্তায় নামেন। পরের ঘরের মাত্র তিন বছরের শিশু সন্তান নিয়ে সিনেমার মতোই অবিশ্বাস্য ঘটনার জন্ম দিয়ে আজ ফুটপাতে বই বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করছেন বনশ্রী। জীবিকার প্রশ্নে আশ্রয় নিয়েছেন এমন এক অবলম্বন, যা মুসলিমদের হৃদয়কে আন্দোলিত করে। তিনি বাসে বাসে নামাজ শিক্ষার বই বিক্রি করতে থাকেন। অনেকে তার পরিচয় পেয়ে হতবিহ্বল হন। নামাজ শিক্ষার বইয়ের কারণে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

এভাবেই চলছে একজন খ্যাতিমান তারকার দুঃখের জীবন। যাদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন নাটক-সিনেমার রঙিন জগত তারা উল্কাবেগে তার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। যার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন, তেমন এক নায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বহুদিন আগের পথ-পরিচয়ের কোনো অস্পষ্ট স্মৃতি যেমন কেউ খুব কষ্ট করে মনে করে, ঠিক তেমনি তিনি বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এই নামের একজন নায়িকার সঙ্গে অভিনয় করেছিলাম! সত্যিই স্যালুকাস! এই জীবনে না আছে দায়, না আছে হৃদয়। কেবলই অভিনয়, প্রবঞ্চনা আর শঠতা। এই শঠতা দিয়েই ধ্বংস করা হচ্ছে হাজার তরুণ-যুবকের জীবন। হতভাগ্য যুবক তা বোঝে জীবনসায়াহ্নে,

জীবনভেলা ভাঙাতীরে ভেড়ার পর!

সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হচ্ছে, বনশ্রী এই সমাজব্যবস্থা, মানুষের সীমাহীন লৌকিকতা ও পাষণ্ডতার প্রতি তীব্র বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন। তথাকথিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তিনি চরম আস্থাহীন হয়ে পড়েছেন। তাই সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘আমি আমার ছেলেকে আলেম বানাবো। সারাবিশ্বের মানুষকে সে আল্লাহ তা‘আলার দিকে ডাকবে। আমি নায়ক বানাবো না। কেননা, নায়ক হলে মদ খাবে, আমাকে ভালোবাসবে না।’

এটাই কুদরতের খেলা! কিছুদিন আগে এক রাজনীতিক বাংলাদেশের আলেম-ওলামা ও মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা কমানোর ঘোষণা দিয়েছেন। কী স্পর্ধা! আল্লাহ তা‘আলা যাদের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত দীন জিন্দা রাখবেন, কুরআন-হাদীসের আলো ও নূর যাদের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত রাখবেন তাদের সংখ্যা কমানো মানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা? নাকি স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা! আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

«مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ»

‘যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলী বা প্রিয় কারও সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধের ঘোষণা দেই।’ [বুখারী : ৬৫০২]

কুরআন ও কুরআনী শিক্ষার বিরুদ্ধে কোনো উদ্যোগ সফল হবে না ইনশাআল্লাহ। যারা এর অপপ্রয়াস চালাবে তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর ঘোষণা :

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَيَأۡبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٣٢ ﴾ [التوبة: ٣٢]

‘তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে।’ (সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৩২)

আরেক আয়াতেও একই কথা বলা হয়েছে :

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٨ ﴾ [الصف: ٨]

‘তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।’ (সূরা আস-সফ, আয়াত : ৮)

ইহুদী-খ্রিস্টানদের সমাজে এবং একজন খ্রিস্টান রমণীকে বগলদাবা করে সংসার করা পাশ্চাত্য ভাবনার এক বাঙালীর পক্ষেই সম্ভব এরূপ ইসলামবিরোধী ঘোষণা দেয়া। কিন্তু যারা বাস্তবজীবনে ঠোকরের পর ঠোকর খেয়েছেন, তথাকথিত শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বৃত্তায়নে যাদের জীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে, যে শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষ একজন বিপন্ন নায়িকার বুক থেকে নিজের মেয়েটিকে কেড়ে নিয়ে পতিতালয়ে বিক্রি করে দিয়েছে এবং যে শিক্ষার সার্টিফিকেটধারীদের কাছে প্রতিকার চাইতে গিয়ে উল্টো হয়রানীর শিকার হয়েছেন সেই শিক্ষার প্রতি তার জেগেছে ঘৃণা, ক্ষোভ ও মর্মপীড়া।

তাই তিনি এমন এক শিক্ষার আশ্রয় নেয়ার পরিকল্পনা করেছেন যে শিক্ষায় সরলতা, সততা, মমতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা আছে। আছে দেশ, মানবতা ও ইসলামী ভাবনার মহত্তম চিন্তা। যে শিক্ষায় নেই প্রতারণা,

ধোঁকাবাজি, অস্ত্রবাজি, টেন্ডারবাজি। নেই ধর্ষণের নূন্যতম অভিজ্ঞতা। সুতরাং সেই শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইসলামবিদ্বেষীদের বগলদাবায় বসবাস করা খিস্ট্রান রমণীর স্বামী একজন নেতা হঠাৎ উড়ে এসে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও করতে পারে। কিন্তু জীবনবাস্তবতায় যিনি সমধিক পরিচিত, তিনিই বোঝেন কোন শিক্ষার কী ফল। তাই তো পোড় খাওয়া ব্যক্তি বনশ্রী বলতে পারেন, ছেলেকে আলেম বানাবো, যাতে করে সে বিশ্বের সকলের সেবা ও খেদমত করতে পারে। মা-বাবাকে ভালোবাসে, মাদক অনাসক্তিতে থাকে।

এফডিসি নামের যে আনন্দশালা সদা মুখরিত থাকে এবং বনশ্রী ও অন্যান্য অভিনেত্রী-অভিনায়কদের জীবন ছিল মুখরিত, যেখানে নিত্য রচিত হয় হাজারও কল্পকাহিনী, যেখান থেকে পরিকল্পনা করা হয় অভিনিত অবাস্তব নাট্যের কারসাজিতে দর্শকদের অশ্র‘‘সিক্ত করার মহড়া, সেখানে যে প্রকৃতপক্ষেই হৃদয়ঘটিত কোনো আবেগ ও সহমর্মিতা নেই তার প্রমাণ পেয়েছেন বনশ্রী নিজেই। বিপদগ্রস্ত হয়ে এফডিসির শিল্পী সমিতিতে সাহায্য চেয়ে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কোনো শিল্পী তার দিকে মুখ ফিরিয়েও তাকাননি। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি সেই গন্তব্যেই ফিরে আসার চেষ্টা করছেন, যা শতসহস্র বছর ধরে ধরার বিভিন্নপ্রান্তের সহায়-সম্বলহীনদের আশ্রয়, যাঁর দরবার কাউকে ফিরিয়ে দেয় না, যেখানে প্রত্যাবর্তনকারীকে সমাদর করা হয় পরম ক্ষমার ঐশ্বর্যে। তাইতো বনশ্রীর মুখে প্রস্ফুটিত হচ্ছে সত্য ও ঘরে ফেরার আকুলতা। আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদনের শ্বাশত অভিপ্রায়। মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে-

‘আমি সর্বদা আল্লাহ তা‘আলাকে ডাকি, ইবাদত বন্দেগি করি। ‘নামায শিক্ষা’র বই বিক্রি করি। একটা লোক আমাকে সাহায্য করেছে। এক সাংবাদিক আছে, যিনি ইয়ং বয়সে আমাকে কাভারেজ দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বাসে দেখেছেন বই বিক্রি করছি। আমাকে তিনি প্রথমে চিনেননি আমিই পরিচয় দিয়েছি। এরপর তার সহায়তায় নিউজ হয়েছে।

‘আল্লাহ তা‘আলার কাছে বলি, হে আল্লাহ তা‘আলা, তুমি সব জানো। যারা আমার বুক খালি করেছে তুমি তার বুক খালি করো। আমার ছেলে আজ কারো বাড়িতে যেতে পারে না। বস্তিতে থেকে থেকে আমি কি যেন হয়ে গেছি। দু‘আ করবেন আল্লাহ তা‘আলা যেন আমার ওপর রহমত নাযিল করেন।’ আরেকটি কথা বলুন, যে লোকটি পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ে সে কীভাবে আমার বুক খালি করে দিলো? আসলে দেখুন ও কীসের মুসলিম। আমি মেয়েকে দশ মাস বুকে লালন করেছি। সে আমার বুক খালি করে দিল? আমি এই ছেলেকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ করছি।’

কাকুতির সঙ্গে আছে বিধ্বস্ত সমাজের অবাঞ্ছিত ফসল থেকে আশ্রয়। ঐশী (উচ্ছৃঙ্খল ও নেশার জীবনের প্রতিবন্ধক মনে করে যে মাবাবাকে একই সঙ্গে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল) তো হাল-আমলের বখে যাওয়া সমাজ সংসারের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন। বনশ্রী নিজ সন্তানকে সেরকম কিছু দেখতে চান না। তাই আকুতির সঙ্গে ঝরে পড়ছে শঙ্কাও। তিনি বললেন, ‘নাকি আমার মেয়েকে ঐশী বানাচ্ছে? আমি আমার মেয়েকে দেখতে চাই। আমি আমার মেয়ের সুন্দর ও শালীন জীবনে দেখতে চাই। ঐশীর মতো দেখতে চাই না।’

হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে বনশ্রীর এই ফিরে আসাকে স্বাগত জানাই। আল্লাহ তা‘আলা তার বর্তমান ও পরকালীন জীবন সুন্দর করুন। তার ছেলেকে আলেম বানানোর যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছেন তা বাস্তবায়ন হোক। যেসব ইসলামবিদ্বেষী ও ইহুদী-খ্রিস্টানদের চর এদেশে ইসলাম থাক, মুসলিম থাক, ইলমে দীনের শিক্ষা থাক তা বরদাশত করতে পারে না, যারা আলেম কমানোর নামে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তারা দেখুক ইলমে দীনের মাহাত্ম্য, বড়ত্ব ও নির্মলতা। বনশ্রীর সেই হতদরিদ্র রোগা ছেলেটি এদেশের একজন মস্ত বড় আলেম হয়ে আল্লাহদ্রোহীদের মুখে চপেটাঘাত করুক আল্লাহর কাছে মনেপ্রাণে সেই কামনাই করি।

আফসোস হয় ক্ষমতাসীনদের দেখে। এরা বিদেশীদেরকে এভাবে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে, তাদের কথায় ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করা, ইসলামের বৈরিতায় তৃপ্তি পায়। যুদ্ধ ঘোষণা করে ইলমে দীনের বিরুদ্ধে। অথচ আমাদের পূর্বপরবর্তী মুসলিম শাসকগণ শুধু ইলমে দীনই নয়; যে কোনো ধরনের শিক্ষা বিস্তারের জন্য সদা তৎপর ছিলেন। খলীফা মামুন এমন সব নিত্যনতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিলেন যা আজকের প্রেক্ষাপটে বড় অদ্ভুত ও বিস্ময়কর বলে না মেনে উপায় নেই। আর ইলমে দীনের প্রচার-প্রসারে তো ছিলেন জীবনোৎসর্গকারী।

পক্ষান্তরে বর্তমান যুগের রাজা-বাদশা ও ক্ষমতাশালীরা নিজেদের সন্তানদেরকে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থায় পারদর্শী করে তৃপ্তির ঢেকুর তোলেন এবং কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামের মৌলিক বিদ্যা থেকে তাদের একেবারেই বঞ্চিত করেন। অতীতের কীর্তিমান শাসকগণের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা তাদের সন্তানদেরকে কুরআন-হাদীসের ইলম দান করে ধন্য হতেন এবং সন্তানদের জীবন ধন্য হয়েছে বলে মনে করতেন। বেশিদিন আগের কথা নয়। মোঘল সম্রাট আলমগীরের কথাই ধরুন। ভারত শাসন করেছেন যাঁরা, তাদের কয়জন তার মতো কৃতিত্ব ও ইতিহাসে স্মরণীয় হতে পেরেছেন?

‘বাদশা আলমগীর,

কুমারে তাহার পড়াইত এক মৌলবী দিল্লির’

হৃদয়কাড়া কবিতার এ অংশই প্রমাণ করে বিখ্যাত মোঘল সম্রাট পুত্রের জন্য কী ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি নিজেও অত্যন্ত ইলম-অনুরাগী ছিলেন। বিশ্বখ্যাত ফাতাওয়ার গ্রন্থ ‘ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী’ তারই তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। আগের যুগের সব খলীফা ও আমীর-উমারা এরূপই ইলমের প্রতি সীমাহীন অনুরাগী ছিলেন। যেমন বিখ্যাত শাসক আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান তার পুত্রকে উপদেশ প্রদান করে বলেছিলেন, ‘হে বৎস! ইলম শিক্ষা করো। কেননা যদি নেতা হও তবে সবার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। যদি মধ্যম ধরনের লোক হও তবে নেতার আসন লাভ করতে পারবে। আর যদি সাধারণ প্রজা হও তবে আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করতে পারবে।’

এরপর তিনি কবিতা আবৃত্তি করে বলেন,

ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته

ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته

وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته

‘যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের কিঞ্চিত তিক্ততা বরদাশত করে না, সে দিনের পর দিন মূর্খতার লাঞ্ছনা গিলতে বাধ্য হয়। যৌবনে যার ইলম শিক্ষা করার সুযোগ হয়নি তার ওপর (জানাযার) চার তাকবীর পাঠ করো। কেননা সে তো মৃত! আল্লাহ তা‘আলার শপথ! যুবকের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তার ইলম ও তাকওয়ার কারণে। আর যদি এই দুটি বস্তু না থাকে তবে তার কোনো মূল্যই নেই।’

কোথায় ইতিহাসের একজন নামকরা প্রতাপশালী শাসক খলীফা মারওয়ান আর কোথাকার কোন নচ্ছান দুদিনের নেতা! যারা কীর্তিমান, যারা মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধার জায়গা করতে চান তারা কখনও জ্ঞান ও ইলমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন না। ইলমের সঙ্গে যুদ্ধ! সে তো তারাই পারে যারা মানুষের হৃদয়ে আবর্জনার মতো ঘৃণা হয়ে ভাসমান থাকতে চায়।

বনশ্রীর জীবনের গল্পটা শেষ করি কবির ‘কাব্যগল্প’ দিয়ে-

এুকুল ভাঙে ওকুল গড়ে এই তো নদীর খেলা

সকাল বেলার আমীর রে ভাই ফকির সন্ধ্যা বেলা

রে ভাই এই তো বিধির খেলা....

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10582

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন